কারণ সামান্যই। সামান্য কারণেই গ্রামে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। এখানকার কামার অনিরুদ্ধ কর্মকার ও ছুতার গিরীশ সূত্রধর নদীর ওপারে বাজারে-শহরটায় গিয়া একটা করিয়া দোকান ফাঁদিয়াছে। খুব ভোরে উঠিয়া যায়, ফেরে রাত্রি দশটায়; ফলে, গ্রামের লোকের অসুবিধার আর শেষ নাই। এবার চাষের সময় কি নাকালটাই যে তাহাদের হইতে হইয়াছে, সে তাহারাই জানে। লাঙলের ফাল পাঁজানো, গাড়ীর হাল বাঁধার জন্য চাষীদের অসুবিধার আর অন্ত ছিল না। গিরীশ ছুতারের বাড়ীতে গ্রামের লোকের বাবলা কাঠের গুঁড়ি আজও স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে সেই গত বৎসরের ফাল্গুন চৈত্র হইতে; কিন্তু আজও তাহারা নূতন লাঙল পাইল না।

এই ব্যাপার লইয়া অনিরুদ্ধ এবং গিরীশের বিরুদ্ধে অসন্তোষের সীমা ছিল না। কিন্তু চাষের সময় ইহা লইয়া একটা জটলা করিবার সময় কাহারও হয় নাই। প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া কার্যোদ্ধার করা হইয়াছে; রাত্রি থাকিতে উঠিয়া অনিরুদ্ধের বাড়ীর দরজায় বসিয়া থাকিয়া, তাহাকে আটক করিয়া লোকে আপন আপন কাজ সারিয়া লইয়াছে; জরুরী দরকার থাকিলে, ফাল লইয়া গাড়ীর চাকা ও হাল গড়াইয়া-গড়াইয়া সেই শহরের বাজার পর্যন্তও লোকে ছুটিয়াছে। দূরত্ব প্রায় চার মাইল—কিন্তু ময়ূরাক্ষী নদীটাই একা বিশ-ক্রোশের সমান। বর্ষার সময় ভরানদীর খেয়া ঘাটেই পারাপারে দেড় ঘণ্টা কাটিয়া যায়। শুকনার সময়ে যাওয়া-আসায় আট মাইল বালি ঠেলিয়া গাড়ীর চাকা গড়াইয়া লইয়া যাওয়া সোজা কথা নয়। একটু ঘুর-পথে নদীর উপর রেলওয়ে ব্রীজ আছে; কিন্তু লাইনের পাশের রাস্তাটা এমন উঁচু ও অল্পপরিসর যে গাড়ীর চাকা গড়াইয়া লইয়া যাওয়া প্রায় অসম্ভব।

এখন চাষ শেষ হইয়া আসিল। মাঠে ফসল পাকিয়া উঠিয়াছে—এখন কাস্তে চাই। কামার চিরকাল লোহা-ইস্পাত লইয়া কাস্তে গড়িয়া দেয়—পুরানো কাস্তেতে সান লাগাইয়া পুরি কাটিয়া দেয়; ছুতার বাঁট লাগাইয়া দেয়। কিন্তু কামার-ছুতার সেই একই চালে চলিয়াছে; যে অনিরুদ্ধের হাত পার হইয়াছে, সে গিরীশের হাতে দুঃখ ভোগ করিতেছে। শেষ পর্যন্ত গ্রামের লোক এক হইয়া পঞ্চায়েৎ-মজলিস্ ডাকিয়া বসিল। কেবল একখানা

গ্রাম নয়, পাশাপাশি দুখানা গ্রামের লোক একত্র হইয়া গিরীশ ও অনিরুদ্ধকে একটি নির্দিষ্ট দিন জানাইয়া ডাকিয়া পাঠাইল। গ্রামের শিবতলায় বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে মজলিস বসিল। মন্দিরে ময়ূরেশ্বর শিব; পাশেই ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামদেবী মা ভাঙা-কালীর বেদী। কালী-ঘর যতবার তৈয়ারী হইয়াছে, ততবারই ভাঙিয়াছে—সেই হেতু কালীর নাম ভাঙা-কালী। চণ্ডীমণ্ডপটিও বহুকালের এবং এক কোণ ভাঙা হইয়া আছে; মধ্যে নাটমন্দির। তার চাল কাঠামো হাতীশুঁড়-যড়দল-তীরসাঙা প্রভৃতি হরেক রকমের কাঠ দিয়া যেন অক্ষয় অমর করিবার উদ্দেশ্যে গড়া হইয়াছিল। নিচের মেঝেও সনাতন পদ্ধতিতে মাটির। এই চণ্ডীমণ্ডপের এই নাট মন্দিরে বা আটচালায় শতরঞ্জি, চাটাই, চট প্রভৃতি বিছাইয়া মজলিস বসিল।

গিরীশ, অনিরুদ্ধ এ ডাকে না আসিয়া পারিল না। যথাসময়ে তাহারা দু'-জনেই আসিয়া উপস্থিত হইল। মজলিসে দুইখানা গ্রামের মাতব্বর লোক একত্র হইয়াছিল; হরিশ মণ্ডল, ভবেশ পাল, মুকুন্দ ঘোষ, কীর্তিবাস মণ্ডল, নটবর পাল—ইহারা সব ভারীক্কী লোক, গ্রামের মাতব্বর সদ্‌গোপ চাষী। পাশের গ্রামের দ্বারকা চৌধুরীও উপস্থিত হইয়াছে। চৌধুরী বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তি, এ অঞ্চলে বিশেষ মাননীয় জন। আচার ব্যবহার ও বিচারবুদ্ধির জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। লোকে এখনও বলে—কেমন বংশ দেখতে হবে! এই চৌধুরীর পূর্ব পুরুষেরাই এককালে এই দুইখানি গ্রামের জমিদার ছিলেন; এখন ইনি অবশ্য সম্পন্ন চাষীরূপেই গণ্য কারণ জমিদারী অন্য লোকের হাতে গিয়াছে। আর ছিল দোকানী বৃন্দাবন দত্ত—সেও মাতব্বর লোক। মধ্যবিত্ত অবস্থার অল্পবয়স্ক চাষী গোপেন পাল, রাখাল মণ্ডল, রামনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতিও উপস্থিত ছিল। এ-গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ বাসিন্দা হরেন্দ্র ঘোষাল—ও গ্রামের নিশি মুখুয্যে, পিয়ারী বাঁড়ুয্যে—ইহারাও একদিকে বসিয়াছিল।

আসরের প্রায় মাঝখানে জাঁকিয়া বসিয়াছিল ছিরু পাল; সে নিজেই আসিয়া জাঁকিয়া আসন লইয়াছিল। ছিরু বা শ্রীহরি পালই এই দুইখানা গ্রামের নূতন সম্পদশালী ব্যক্তি। এ অঞ্চলের মধ্যে বিশিষ্ট ধনী যাহারা, ছিরু ধন-সম্পদে তাহাদের কাহারও চেয়ে কম নয়—এই কথাই লোকে অনুমান করে। লোকটার চেহারা প্রকাণ্ড; প্রকৃতিতে ইতর এবং দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। সম্পদের জন্য যে প্রতিষ্ঠা সমাজ মানুষকে দেয়, সে প্রতিষ্ঠা ঠিক ঐ কারণেই ছিরুর নাই। অভদ্র, ক্রোধী, গোঁয়ার, চরিত্রহীন, ধনী ছিরু পালকে লোকে বাহিরে সহ্য করিলেও মনে মনে ঘৃণা করে, ভয় করিলেও সম্পদোচিত সম্মান কেহ

দেয় না। এজন্য ছিরুর ক্ষোভ আছে, লোকে তাহাকে সম্মান করে না বলিয়া সেও সকলের উপর মনে মনে রুষ্ট। প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা জোর করিয়া আদায় করিতে সে বদ্ধপরিকর। তাই সাধারণের সামাজিক মজলিস হইলেই ঠিক মাঝখানে আসিয়া সে আঁকিয়া বসে।

আর একটি সবল দেহ দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ যুবা নিতান্ত নিস্পৃহের মত একপাশের থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে দেবনাথ ঘোষ,—এই গ্রামেরই সদ্‌গোপ-চাষীর ছেলে। দেবনাথ নিজ-হাতে চাষ করে না, স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত সে। এ মজলিসে আসিবার বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও সে আসিয়াছে; অনিরুদ্ধের যে অন্যায় সে অন্যায়ের মূল কোথায় সে জানে। ছিরু পালের মত ব্যক্তি যে মজলিসে মধ্যমণির মত জমকাইয়া বসে, সে মজলিসে তাহার আস্থা নাই বলিয়াই এই নিস্পৃহতা; নীরব অবজ্ঞার সহিত সে একপাশে থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আসে নাই কেবল ও-গ্রামের কৃপণ মহাজন মৃত রাধহরি চক্রবর্তীর পোষ্যপুত্র হেলারাম, চাটুজ্জে ও গ্রাম্য ডাক্তার জগন্নাথ ঘোষ। গ্রামের চৌকিদার ভূপাল লোহারও উপস্থিত ছিল। আশেপাশে ছেলেদের দল গোলমাল করিতেছিল, একেবারে একপ্রান্তে গ্রামের হরিজন চাষীরাও দাঁড়াইয়া দর্শক হিসাবে। ইহারাই গ্রামের শ্রমিক চাষী—অসুবিধার প্রায় বারো-আনা ভোগ করিতে হয় ইহাদিগকেই।

অনিরুদ্ধ এবং গিরীশ আসিয়া মজলিসে বসিল। বেশভূষা অনেকটা পরিচ্ছন্ন এবং ফিটফাট—তাহার মধ্যে শহুরে ফ্যাশানের ছাপ সুস্পষ্ট; দুইজনেই সিগারেট টানিতে টানিতে আসিতেছিল—মজলিসের অনতিদূরেই ফেলিয়া দিয়া মজলিসের মধ্যে আসিয়া বসিল।

অনিরুদ্ধ কথা আরম্ভ করিল; বসিয়াই হাত দিয়া একবার মুখটা বেশ করিয়া মুছিয়া লইয়া বলিল—কই গো, কি বলছেন বলুন। আমরা খাটি-খুটি খাই; আমাদের আজ এ বেলাটাই মাটি।

কথার ভঙ্গিমায় ও সুরে সকলেই একটু চকিত হইয়া উঠিল যেন ঝগড়া করিবার মত লোভেই কোমর বাঁধিয়া আসিয়াছে; প্রবীণের দলের মধ্যে সকলেই একবার সশব্দে গলা ঝাড়িয়া লইল। অল্পবয়সীদের ভিতর হইতে যেন একটা আগুন দপ করিয়া উঠিল। ছিরু ওরফে শ্রীহরি বলিয়া উঠিল—মাটিই যদি মনে কর, তবে আসবারই বা কি দরকার ছিল?

হরেন্দ্র ঘোষাল কথা বলিবার জন্য হাঁক-পাক করিতেছিল; সে বলিল—

তেমনমনে হলে এখনও উঠে যেতে পার তোমরা। কউ ধরে নিয়েওআসে নাই, বেঁধেও রাখে নাই তোমাদিগে।

হরিশ মণ্ডল এবার বলিল—চুপ কর তোমরা। এখানে যখন ডাকা হয়েছে, তখন আসতেই হবে। তা তোমরা এসেছ, বেশ কথা—ভাল কথা, উত্তম কথা। তারপর এখন দু'পক্ষে কথাবার্তা হবে, আমাদের বলবার যা বলব—তোমাদের জবাব যা তোমরা দেবে; তারপর তার বিচার হবে। এত তাড়াতাড়ি করলে হবে কেন? ঘোড়া দুটো বাঁধো।

গিরীশ বলিল—তা হলে, কথা আপনাদের আমাদিগে নিয়েই?

অনিরুদ্ধ বলিল—তা আমরা আঁচ করেছিলাম। তা বেশ, কি কথা আপনাদের বলুন? আমাদের জবাব আমরা দোব। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন—আপনারা সবাই যখন একজোট হয়েছেন, তখন এ-কথার বিচার করবে কে? নালিশ যখন আপনাদের, তখন আপনারা বিচার কি করে করবেন—এতো আমরা বুঝতে পারছি না।

দ্বারকা চৌধুরী অকস্মাৎ গলা ঝাড়িয়া শব্দ করিয়া উঠিল; চৌধুরীর কথা বলিবার এটি পূর্বাভাস। উচ্চ গলা-ঝাড়ার শব্দে সকলে চৌধুরীর দিকে ফিরিয়া চাহিল। চৌধুরীর চেহারায় এবং ভঙ্গিমাতে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। গৌরবর্ণ রং, পাকা ধবধবে গোঁফ, আকৃতিতে দীর্ঘ। মানুষটি আসরের মধ্যে আপনা আপনি বিশিষ্ট হইয়া বসিয়াছিল। সে এবার মুখ খুলিল—দেখ কর্মকার, কিছু মনে কর না বাপু, আমি একটা কথা বলব। গোড়া থেকেই তোমাদের কথাবার্তার সুর শুনে মনে হচ্ছে যেন তোমরা বিবাদ করবার জন্তে তৈরী হয়ে এসেছ! এটা তো ভাল নয় বাবা। বস, স্থির হয়ে বস।

অনিরুদ্ধ এবার সবিনয়ে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল—বেশ, বলুন কি বলছেন।

হরিশ মণ্ডলই আরম্ভ করিল—দেখ বাপু, খুলে বলতে গেলে মহাভারত বলতে হয়। সংক্ষেপেই বলছি—তোমরা দু'জনে শহরে গিয়ে আপন আপন ব্যবসা করতে বসেছ। বেশ করেছ। যেখানে মানুষ দুটো পয়সা পাবে সেইখানেই যাবে। তা যাও। কিন্তু এখানকার পাট যে একেবারে তুলে দেবে, আর আমরা যে এই দু'কোশ রাস্তা জিনিসপত্র ঘাড়ে করে নিয়ে ছুটব ওই নদী পার হয়ে, তা তো হবে না বাপু। এবার যে তোমরা আমাদের কি নাকাল করেছ সে কথাটা ভেবে দেখ দেখি মনে মনে।

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, তা অসুবিধে একটুকুন হয়েছে আপনাদের।

ছিরু বা শ্রীহরি গর্জিয়া উঠিল—একটুকুন! একটুকুন কি হে? জান,

ছিরু সাপের মত গর্জিয়া উঠিল—পাও না? কে দেয় নি শুনি? মুখে পাই না বললে তো হবে না। বল, কার কাছে পাবে তোমরা?

অনিরুদ্ধ দুরন্ত ক্রোধে বিদ্যুৎগতিতে ঘাড় ফিরাইয়া শ্রীহরির দিকে চাহিয়া বলিল—কার কাছে পাব? নাম করতে হবে? বেশ, বলছি!—তোমার কাছেই পাব!

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ তোমার কাছে। দিয়েছ ধান তুমি দু'বছর? বল?

—আর আমি যে তোমার কাছে হাণ্ডনোটে টাকা পাব! তাতে ক'টাকা উশুল দিয়েছ শুনি? ধান দিই নাই—মজলিসের মধ্যে তুমি যে এত বড় কথাটা বলছ।

—কিন্তু তার তো একটা হিসেব-নিকেশ আছে? ধানের দামটা তোমার হাণ্ডনোটের পিঠে উশুল দিতে তো হবে—না কি? বলুন চৌধুরী মশায়, মণ্ডল মশাইরাও তো রয়েছেন, বলুন-না।

চৌধুরী বলিল—শোন, চুপ কর একটু। শ্রীহরি, তুমি বাবা হাণ্ডনোটের পিঠে টাকাটা উশুল দিয়ে নিয়ো। আর অনিরুদ্ধ, তোমরা একটা বাকীর ফর্দ তুলে, হরিশ মণ্ডল মশায়কে দাও। এ নিয়ে মজলিসে গোল করাটা তো ভাল নয়। ওঁরাই সব আদায়-পত্র করে দেবেন। আর তোমরাও গাঁয়ে একটা করে পাট রাখ। যেমন কাজকর্ম করছিলে তেমনি কর।

মজলিস-শুদ্ধ সকলেই এ কথায় সায় দিল। কিন্তু অনিরুদ্ধ এবং গিরীশ চুপ করিয়া রহিল, ভাবে-ভঙ্গিতেও সম্মতি বা অসম্মতির কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না।

এতক্ষণে দেবনাথ মুখ খুলিল; প্রবীণ চৌধুরীর এ মীমাংসা তাহার ভাল লাগিয়াছে। অনিরুদ্ধ-গিরীশের পাওনা অনাদায়ের কথা সে জানিত বলিয়াই তাহার প্রথমে মনে হইয়াছিল—অনিরুদ্ধ এবং গিরীশের উপর মজলিস অবিচার করিতে বসিয়াছে। নতুবা গ্রামের সমাজ-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবারই সে পক্ষপাতী। তাহার নিজের একটি নিয়ম শৃঙ্খলার ধারণা আছে। সেই ধারণা অনুযায়ী আজ চৌধুরী ছিরুর মত লোকের অন্যায়ের বিচার করিয়া যে ব্যবস্থা করিল, তাহাতে দেবু খুশী হইল; অনিরুদ্ধ ও গিরীশের এবার নত হওয়া উচিত বলিয়া তাহার মনে হইল। সে বলিল—অনি ভাই, আর তো তোমাদের আপত্তি করা উচিত নয়।

চৌধুরী প্রশ্ন করিল—অনিরুদ্ধ?